দ্বাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে

এই অধ্যায়টিতে শ্রীবৃন্দাবনধামের অধিবাসীদের শুদ্ধ প্রেমের পরম উৎকর্ষতা এবং তাঁদের পবিত্র সঙ্গ লাভের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে।

শুদ্ধসাত্ত্বিক ভগবদ্ভক্তগণের সান্নিধ্যের ফলে জড়জাগতিক জীবনধারায় জীবাত্মার আসক্তির বিনাশ হয় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও ভক্তগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে দিতে সক্ষম হয়। যোগচর্চা, সাংখ্য দর্শন চর্চা, সাধারণ ধর্মাচরণ, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, শুদ্ধসাত্ত্বিক কৃচ্ছ্রতাসাধন, অনাসক্তি তথা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ, ইষ্টা এবং পূর্তম্ বিষয়ক ক্রিয়াকর্ম অভ্যাস, দানধ্যান, উপবাস ব্রতপালন, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, গুপ্ত মন্ত্রাদি চর্চা, পুণ্যতীর্থস্থান দর্শন, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অথবা সামান্য অনুশাসনাদি পালন কোনও কিছুতেই সেই রকম সুফল অর্জন করা যায় না। প্রত্যেক যুগেই রজোগুণ ও তমোগুণাশ্রিত অসুর, দানব, পশু ও পাখি থাকে, এবং ব্যবসায়ী, নারী, কর্মী, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এবং আরও নানা ধরনের লোক থাকে, যারা বৈদিকশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতে পারে না। তা সত্ত্বেও, ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে শুদ্ধতার প্রভাবে তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের পরমধাম অর্জন করতে পারে, অন্যদিকে ঐ ধরনের সাধুসঙ্গের অভাবে, যোগচর্চা, সাংখ্যচর্চা, দানধ্যান, ব্রতপালন এবং সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলন করার মাধ্যমে অতীব নিষ্ঠা সহকারে চর্চা করা সত্ত্বেও পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে তারা অপারগ হয়েই থাকে।

ব্রজধামের গোপিকাগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ হলেও, তাঁদের আনন্দ দানের যোগ্য পুরুষ প্রেমাস্পদ রূপে তাঁকে স্বীকার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের নিত্য সঙ্গলাভের সামর্থ্যে, তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ পরমতত্ত্ব অর্জন করেছিলেন, যা ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও অর্জন করতে পারেনি। বৃন্দাবনের গোপিকারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমনই গভীর আসক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সাথে একাত্ম ও অন্তরঙ্গতা অর্জনের ভাবোল্লাসে তাঁদের মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বলে তাঁর সাথে সারা রাত সঙ্গসুখ উপভোগের পরেও তা যেন, একটি মাত্র মুহূর্তের সামান্য একাংশ মনে হয়েছিল। অবশ্য, যখন অক্রুর একদা বলদেবের সঙ্গে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন, গোপিকারা তখন প্রতিটি রাত্রি তাঁর সঙ্গবিহনে দেবতাদের এক লক্ষ বছরের সমান কালক্ষেপ বলে মনে করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিরহের বেদনায়

জর্জরিত হয়ে, তাঁর প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কোনও কিছুতেই তাঁদের তৃপ্তি হতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করতেও পারেন নি। গোপিকাদের শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই নিদর্শন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল উপদেশাবলী উদ্ধবকে প্রদানের পরে, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধির প্রয়োজনে, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে যেভাবে ধর্ম এবং অধর্মের সকল প্রকার বিচার-বিবেচনা উপস্থাপিত হয়েছে, সেই সবই উদ্ধবের বর্জন করা উচিত এবং তার পরিবর্তে শ্রীবৃন্দাবনধামের গোপিকাদের দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ১-২

শ্রীভগবানুবাচ

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥ ১ ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ন রোধয়তি**—রোধ করে না; **মাম্**—আমাকে; **যোগঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগ পদ্ধতি; **ন**—নয়; **সাংখ্যম্**—জড়জাগতিক উপাদান তত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন; **ধর্মঃ**—অহিংসা প্রভৃতি সাধারণ সৎকার্যাবলী; **এব**—অবশ্য; **চ**—ও; **ন**—না; **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদশাস্ত্রাদির মন্ত্রোচ্চারণ; **তপঃ**—কৃচ্ছ্রতা; **ত্যাগঃ**—সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা; **ন**—নয়; **ইষ্টা-পূর্তম্**—কূপ খনন বা বৃক্ষরোপণের মতো জনকল্যাণ মূলক কাজ এবং যাগযজ্ঞ উদ্‌যাপন; **ন**—তাও নয়; **দক্ষিণা**—দানধ্যান; **ব্রতানি**—একাদশী তিথিতে সম্পূর্ণ উপবাস পালনের মতো ব্রতাদি উদ্‌যাপন; **যজ্ঞঃ**—দেবতাদের আরাধনা; **ছন্দাংসি**—গুপ্ত মন্ত্রাদি উচ্চারণ; **তীর্থানি**—পুণ্য পবিত্র তীর্থস্থানে গমন; **নিয়মাঃ**—পারমার্থিক নিষ্ঠা পালনের উদ্দেশ্যে মূল উপদেশাবলী পালন; **যমাঃ**—এবং সাধারণ বিধিনিয়মাদিও; **যথা**—যেমন; **অবরুন্ধে**—নিয়ন্ত্রণে আসে; **সৎ-সঙ্গঃ**—আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ; **সর্ব**—সকল; **অপহঃ**—দূর করে; **হি**—অবশ্যই; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব, আমার শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গসান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় উপভোগের সকল বিষয়বস্তুর প্রতি আসক্তি বিনাশ করা যায়। ঐভাবে শুদ্ধ সঙ্গলাভের মাধ্যমে আমাকে আমার ভক্তের

নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ প্রক্রিয়া অভ্যাস, জড়াপ্রকৃতির উপাদান সমূহের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের চর্চায় আত্মনিয়োগ, অহিংসাব্রত উদ্‌যাপন এবং দানধ্যানের অন্যান্য সাধারণ নীতিনিয়মাদি উদ্‌যাপন, বেদশাস্ত্রাদি উচ্চারণ, ব্রতাদি উদ্‌যাপন, সন্ন্যাস আশ্রমে জীবন যাপন, যজ্ঞাদিপালন এবং কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপন, ধর্মাচরণ, কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন, দেবতাদের পূজা অর্চনা, গুপ্তমন্ত্রাদি উচ্চারণ, তীর্থস্থান দর্শন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ নিয়মনিষ্ঠাদি বিষয়ক অনুশাসনাদি পালন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে, কিন্তু ঐ ধরনের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও কেউ আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করতে পারে না।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোক প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল। ভগবানের ভক্তমণ্ডলীর সেবার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনার আয়োজন কিংবা তাঁদের সঙ্গলাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভই যথেষ্ট, কারণ ঐ ধরনের ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গসান্নিধ্যের মাধ্যমেই পারমার্থিক উন্নতির সব কিছুই শিক্ষা লাভ করা যায়। যথার্থ জ্ঞান আহরণ করা হলে, মানুষ যা কিছু অভিলাষ করে, তা সবই অর্জন করতে পারে, কারণ ভগবদ্ভক্তিসেবা অনুশীলনের মাধ্যমে অচিরেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আশীর্বাদ লাভ হয়ে থাকে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের ব্রত সকল প্রকার জড়াপ্রকৃতির গুণাবলীকে অতিক্রম করে যায়, এবং এই সকল বিষয় বদ্ধ জীবগণের কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন—*হবিষাগ্নৌ যজেত মাং*—"যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের মাধ্যমে আমাকে আরাধনা করা যায়।" (ভাগবত ১১/১১/৪৩) এছাড়া, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রমোদ উদ্যান, পুষ্পকানন, সবজি বাগান ইত্যাদি গঠন করা উচিত। এইগুলির মাধ্যমে মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে আকৃষ্ট করা যায়, যেখানে তারা ভগবানের পবিত্র দিব্য নাম জপ কীর্তনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের গঠন প্রকল্পগুলিকে *পূর্তম্* অর্থাৎ জনকল্যাণকর কর্মকাণ্ডরূপে স্বীকার করা উচিত। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দুটি শ্লোকে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে যোগচর্চা, দর্শন চর্চা, যাগযজ্ঞ এবং জনকল্যাণকার্যের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ফললাভ করা যায়, তা হলেও এই সকল গৌণ ক্রিয়াকর্মও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদন করে থাকে, তবে তা স্বল্প

পরিমাণে স্বীকৃত হয়। বিশেষত ঐ প্রকার অনুষ্ঠান-উদ্যোগগুলি সাধারণ জড়জাগতিক মানুষদের অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তজনের দ্বারা সম্পন্ন হলে তা ভগবানের কাছে অধিকতর প্রীতিপদ হয়ে ওঠে। এই কারণেই তুলনামূলক প্রতিশব্দ—*যথা* (তুলনামূলক পরিমাণে) প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা চলে যে, যাগযজ্ঞাদি, কৃচ্ছ্রসাধন এবং দর্শনচর্চা ভগবদ্ভক্তি নিবেদনের ক্ষেত্রে মানুষকে যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করতেও পারে, এবং সেইপ্রকার ক্রিয়াকর্ম যখন ভক্তবৃন্দের দ্বারা পারমার্থিক প্রগতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তখন সেইগুলি ভগবানের কাছে অধিকতর প্রীতিপদ হয়ে ওঠে।

ব্রতানি, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়ক দৃষ্টান্তগুলি পর্যালোচনা এই প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হতে পারে। একাদশী তিথি উপলক্ষ্যে উপবাস-ব্রত পালন করা উচিত, এই অনুশাসনটি সকল বৈষ্ণবদেরই চিরকালের প্রতিজ্ঞা, এবং এই শ্লোকগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা অনুচিত যে, একাদশী ব্রত উদ্‌যাপনে অবহেলা করা চলতে পারে। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তজনের সাথে সৎ সঙ্গলাভের উত্তম ফললাভ তথা ভগবৎপ্রেম অর্জন করার সার্থকতা স্বীকার করার মাধ্যমে এমন মনে করা অনুচিত যে, অন্যান্য গৌণ প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করা উচিত কিংবা সেইগুলি ভক্তিযোগ অর্জনের অনুকূল কোনও প্রকার দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। অনেক বৈদিক অনুশাসন আছে, যেগুলির মাধ্যমে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান দেওয়া হয়েছে, এবং আধুনিক কালের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরাও প্রায়ই অগ্নিযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে থাকেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবানই ঐ ধরনের যজ্ঞের অনুমোদন করেছেন, এবং তাই ভগবদ্ভক্তদের পক্ষে তা বর্জন করা উচিত নয়। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও শুদ্ধাচারমূলক প্রক্রিয়াগুলি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে, ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নতি লাভ করা যায়, যেখান থেকে পরম তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উপাসনার সক্ষমতা অর্জিত হয়। একটি বৈদিক অনুশাসনে রয়েছে, "কোনও একটি মাসে ছয়টি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একাদিক্রমে উপবাস উদ্‌যাপনের ফলে যে সুকৃতি অর্জন করা যায়, তা অনায়াসেই এক মুষ্টি অন্ন শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ রূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এই সুযোগ বিশেষত কলিযুগে সহজলভ্য হয়েছে।" তা হলেও, একাদশী তিথিতে নিয়ন্ত্রিত উপবাস পালন করলে পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয় না। বরং, তা ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলনের পক্ষে নিত্যকালের বিষয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তগণের পূজা-অর্চনার মূল নীতির সহায়ক রূপে পালনীয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যেহেতু এই ধরনের গৌণ নিয়মনীতিগুলি মানুষকে তার প্রাথমিক ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের ব্রত সাধনে উপযুক্ত করে তুলতে

সহায়তা করে থাকে, তাই সেইগুলিও বিশেষভাবে কল্যাণকর। সুতরাং, ঐ সকল গৌণ রীতিনীতিগুলিও বৈদিক শাস্ত্রাদির মধ্যে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিদ্ধান্তস্বরূপ বলা চলে যে, ঐ ধরনের গৌণ নিয়মনীতিগুলি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলনে বিশেষ অপরিহার্য, এবং তাই ব্রতাদি পালন তথা শাস্ত্রে নির্ধারিত প্রতিজ্ঞা পালনের রীতিনীতি বর্জন করা কখনই উচিত নয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, *আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্* (*ভাগবত* ১১/১১/৩২) শব্দগুলি বোঝায় যে, ভগবদ্ভক্তের এমনভাবে বৈদিক রীতিনীতি নির্বাচন করা উচিত যাতে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর সেবা নিবেদনের পদ্ধতিতে কোনও প্রকারে বিঘ্ন সাধন না হয়। উপবাস, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা এবং যোগচর্চার জন্য নির্দিষ্ট বহু বিশদ বৈদিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদি এবং জটিল পদ্ধতি *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* অর্থাৎ ভগবানের নাম শ্রবণ কীর্তনের পরম কল্যাণকর পদ্ধতির মাঝে বিপুল বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে; সুতরাং সেইগুলি বৈষ্ণবেরা পরিত্যাগ করেছেন। মহাপ্রয়াণোন্মুখ ভীষ্মদেব একদা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৯/২৭) মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম *দানধর্ম*, অর্থাৎ জনসাধারণে দানধ্যান, *রাজধর্ম*, অর্থাৎ রাজার কর্তব্যকর্ম, *মোক্ষধর্ম*, অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্য কর্তব্যকর্ম, *স্ত্রীধর্ম*, অর্থাৎ নারীদের কর্তব্যকর্ম, এবং অবশেষে *ভাগবত-ধর্ম*, অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেছেন। ভীষ্মদেব তাঁর আলোচনা ভাগবত-ধর্মেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে একজন রাজা হয়ে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, এবং তাঁর সেবা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির মহারাজকে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের আনুপূর্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছিল। অবশ্য, সমাজে এই ধরনের নির্ধারিত ভক্তিমূলক সেবা নিবেদন যিনি করেন না, তাঁর পক্ষে বৈদিক রীতিনীতি অনুসারেও অভ্যাস-অনুশীলনের মাধ্যমে জড়জগতে বিজড়িত হয়ে থাকা অনাবশ্যক।

মহারাজ অম্বরীষের দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও নির্ধারিত ব্রতাদি উদ্‌যাপনের নীতি বর্জন না করা সংক্রান্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে আমরা দেখি যে, মহারাজ অম্বরীষ যদিও বিশদভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি পালন করেছিলেন, তবুও তাঁর সকল সময়েই লক্ষ্য ছিল ভগবানের প্রীতিসাধন। তাঁর রাজ্যের নাগরিকেরা স্বর্গে যেতে অভিলাষী ছিল না, কারণ তারা সর্বদাই বৈকুণ্ঠের গুণগাথা শ্রবণ করত। অম্বরীষ মহারাজ তাঁর মহিষীর সঙ্গে এক বৎসর যাবৎ

একাদশী এবং দ্বাদশী ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন। যেহেতু অম্বরীষ মহারাজকে বৈষ্ণবদের মধ্যে নবরত্ন স্বরূপ সমাদার করা হত, এবং যেহেতু তাঁর আচার-আচরণ ছিল আদর্শ, তাই অবধারিতভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ঐ ধরনের একাদশী ব্রতাদি উদ্‌যাপন করা বৈষ্ণবদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া বৈদিক শাস্ত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে, "যদি অবহেলাভরে কোনও বৈষ্ণব একাদশী তিথিতে উপবাস না করে, তবে তার পক্ষে ভগবান বিষ্ণুর সেবা অর্চনা সবই বৃথা, এবং তাঁকে নরকে যেতে হবে।" আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যগণ একাদশী তিথিতে শস্যাদি আহারে বিরত থাকেন, এবং এই ব্রত সংঘের সকল সদস্যেরই পালন করে চলা উচিত।

যদি কেউ অনর্থক মনে করে যে, বিপুল পরিমাণে কৃচ্ছ্রতা সাধন, সংস্কৃত শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়ন, বিশেষভাবে দানধ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, তা হলে তার কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা ব্যাহত এবং ক্ষীণ হয়ে যাবে। অবিরাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে যিনি নিয়োজিত থাকতেন, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করা উচিত। যদি উপবাস, অধ্যয়ন, কৃচ্ছ্রতা সাধন বা যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপযোগী যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে, তা হলে সেই সকল কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও প্রীতিপদ হয়। তবে ভগবান সুস্পষ্টভাবেই এখানে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, ঐ ধরনের কার্যকলাপ কখনই ভক্তিযোগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে মূল কর্তব্য হয়ে উঠতে পারে না। সেইগুলি অবশ্যই সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভগবৎ মহিমা শ্রবণ কীর্তনে নিয়োজিত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে সহযোগী প্রক্রিয়া রূপেই অনুসরণ করা উচিত। শ্রীল মধ্বাচার্য বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তদের অসন্তুষ্ট করে এবং তাঁদের সঙ্গলাভের শিক্ষা লাভ না করেন, তা হলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং সেই ধরনের মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন যাতে ভগবৎ সঙ্গলাভের মাঝে সে প্রবেশ করতে না পারে।

শ্লোক ৩-৬

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ৪ ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৫ ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে ॥ ৬ ॥

সৎ-সঙ্গেন—আমার ভক্তবৃন্দের সাথে সঙ্গলাভের মাধ্যমে; **হি**—অবশ্যই; **দৈতেয়াঃ**—দিতির পুত্রগণ; **যাতুধানাঃ**—অসুরগণ; **মৃগাঃ**—পশুগণ; **খগাঃ**—পাখিরা; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **অপ্সরসঃ**—স্বর্গের বারনারীগণ; **নাগাঃ**—সর্পেরা; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা; **চারণঃ**—চারণেরা; **গুহ্যকাঃ**—গুহ্যকগণ; **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধরলোকের অধিবাসীগণ; **মনুষ্যেষু**—মানবজাতির মধ্যে; **বৈশ্যাঃ**—ব্যবসায়ী লোকেরা; **শূদ্রাঃ**—শ্রমিকেরা; **স্ত্রিয়ঃ**—নারীগণ; **অন্ত্যজাঃ**—অসভ্য অন্ত্যজ লোকেরা; **রজঃ-তমঃ-প্রকৃতয়ঃ**—যারা রজো ও তমোগুণে আচ্ছন্ন; **তস্মিন্ তস্মিন্**—প্রত্যেকের মধ্যেই; **যুগে যুগে**—যুগগুলিতে; **বহবঃ**—বহু জীবগণ; **মৎ**—আমার; **পদম্**—বাসস্থান; **প্রাপ্তাঃ**—লব্ধ; **ত্বাষ্ট্র**—বৃত্রাসুর; **কায়াধব**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **আদয়ঃ**—এবং তাদের মতো অন্যদের; **বৃষপর্বা**—বৃষপর্বা নামে; **বলিঃ**—বলি মহারাজ; **বাণঃ**—বাণাসুর; **ময়ঃ**—ময় দানব; **চ**—ও; **অথ**—এইভাবে; **বিভীষণঃ**—রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ; **সুগ্রীবঃ**—বানর রাজ সুগ্রীব; **হনুমান্**—মহাভক্ত হনুমান; **ঋক্ষঃ**—জাম্ববান; **গজঃ**—ভক্ত হস্তী গজেন্দ্র; **গৃধ্রঃ**—জটায়ু নামে শকুন; **বণিক্পথঃ**—ব্যবসায়ী তুলাধার; **ব্যাধঃ**—ধর্ম ব্যাধ; **কুব্জা**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্তা পূর্বতন বারনারী কুব্জা; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **যজ্ঞ-পত্ন্যঃ**—যজ্ঞের ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ; **তথা**—সেইভাবে; **অপরে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

প্রত্যেক যুগেই রজো এবং তমোগুণাশ্রিত বহু জীব আমার ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে থাকে। সেইভাবে, দৈত্যগণ, রাক্ষসেরা, পশুপাখি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, সর্পেরা, সিদ্ধগণ, চারণেরা, গুহ্যকেরা এবং বিদ্যাধরগণ, তাছাড়া, বৈশ্য, শূদ্র, নারী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাও আমার পরমধাম লাভ করে থাকে। বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তাঁদের মতো অন্যেরাও আমার ভক্তসঙ্গের মাধ্যমে আমার ধাম প্রাপ্ত হয়েছে, তা ছাড়া বৃষপর্বা, বলি মহারাজ, বাণাসুর, ময়দানব, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার, ধর্মব্যাধ, কুব্জা, বৃন্দাবনের গোপীগণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদের পত্নীগণও সেইভাবে উদ্ধার লাভ করেছে।

তাৎপর্য

ভগবানের কাছে যাঁরা আত্মসমর্পণ করেন, কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে তিনিও আত্মসমর্পণ করে থাকেন, তা বোঝানোর জন্য বৃন্দাবনের ভক্ত গোপীগণ ও বাণাসুরের মতো দৈত্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায় যে, গোপীগণ ও অন্যান্য যে সকল ভক্তদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেম অর্জন করেছিলেন, আর দৈত্যদানবেরা সচরাচর শুধুমাত্র মুক্তিলাভের সুযোগই লাভ করে থাকে। অনেক অসুর বিভিন্ন ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জন করার ফলে তাদের জীবনে বিবিধপ্রকার কার্যকলাপের মধ্যেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্মরূপে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক সেবা নিবেদনের কর্তব্যই গ্রহণ করে নিয়েছিল, তবে প্রহ্লাদ ও বলি মহারাজের মতো সমুন্নত উত্তমশ্রেণীর ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না, এবং সেই জন্য ভক্তিমূলক সেবাব্রতই তাঁরা জীবনধর্ম রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, ভক্তিপথে সংস্কার লব্ধ অসুরদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাঠকমণ্ডলী ভগবদ্ভক্ত সমাজে সঙ্গলাভের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে কল্যাণ প্রাপ্তির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন।

দানব বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে রাজা চিত্রকেতু রূপে নারদ মুনি, অঙ্গিরাঋষি এবং ভগবান সঙ্কর্ষণের সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র বলে প্রহ্লাদ মহারাজকেও দৈত্য বা অসুর বলে মনে করা হত। তা সত্ত্বেও, তাঁর জননী কয়াধূর গর্ভে থাকাকালীন তিনি শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে নারদমুনির সঙ্গসুখ লাভ করতে পেরেছিলেন। দানব বৃষপর্বাকে তার জননী জন্মের সময়েই পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু সে এক মুনির কাছে প্রতিপালিত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বলি মহারাজ তাঁর পিতামহ প্রহ্লাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং ভগবান বামনদেবেরও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। বলি মহারাজের পুত্র বাণাসুর তার পিতার সঙ্গ এবং দেবাদিদেব শিবের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিলেন। দেবাদিদেব শিবের বর স্বরূপ এক হাজার হাত সে লাভ করেছিল, তার মধ্যে মাত্র দুটি হাত বাকি রেখে অন্য সমস্ত হাত যখন ভগবান কেটে দিয়েছিলেন, তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ তার ভাগ্যে সম্ভব হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধির ফলে, বাণাসুরও এক মহান ভগবদ্ভক্ত হয়ে উঠেছিল। আর এক অসুর ময়দানবও পাণ্ডবদের জন্য এক সভাগৃহ তৈরি করে দিয়েছিল এবং সেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার ফলে অবশেষে ভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিল। রাক্ষসরাজ রাবণের

ভ্রাতা বিভীষণ ছিল ধর্মপ্রাণ রাক্ষস, এবং হনুমান ও শ্রীরামচন্দ্রের সাথে তার সঙ্গলাভ হয়েছিল।

সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান ও গজেন্দ্র এরা পশু হলেও ভগবানের কৃপা লাভ করতে পেরেছিল। জাম্ববান, অর্থাৎ ঋক্ষরাজ ছিল বানরকুলের জীব। স্যমন্তক মনি উদ্ধার প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে সে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেছিল। গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ভক্তসঙ্গ লাভ করেছিল এবং তার শেষ জীবনে গজেন্দ্ররূপে সে স্বয়ং ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেয়েছিল। জটায়ু নামে যে পাখিটি তার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল, সে গরুড় এবং মহারাজ দশরথ ছাড়াও রামলীলার অন্তর্গত অন্যান্য ভক্তবৃন্দেরও সঙ্গ লাভ করেছিল। সীতা ও ভগবান শ্রীরামের সাথেও তার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, নাগকুল, সিদ্ধগণ, চারণবৃন্দ, গুহ্যকগণ এবং বিদ্যাধরেরা ভক্তবৃন্দের সাথে যেভাবে সান্নিধ্য লাভ করেছিল, তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বণিকপথ নামে এক বৈশ্যের কাহিনী *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে জাজলি মুনির অহঙ্কার প্রকাশের ঘটনা প্রসঙ্গে।

বরাহপুরাণে বর্ণিত ধর্মব্যাধ নামে এক অহিংস ব্যাধের কাহিনী উল্লেখের মাধ্যমে ভক্তসঙ্গ লাভের উপযোগিতা পরিস্ফুট হয়েছে। পূর্বজন্মে কোনও কারণে সে ব্রহ্মরাক্ষস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-প্রেত রূপ লাভ করেছিল, কিন্তু অবশেষে সে পরিত্রাণ পেয়েছিল। পূর্বকল্পের কলিযুগে বাসু নামে এক বৈষ্ণবরাজার সান্নিধ্য সে লাভ করেছিল। কুব্জা মহিলা প্রত্যক্ষভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছিল, এবং পূর্বজন্মে সে নারদমুনির সান্নিধ্য অর্জন করতে পেরেছিল। বৃন্দাবনধামের গোপিকারাও তাঁদের পূর্বজন্মে সাধু পুরুষদের সেবাদানের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভক্তবৃন্দের সাথে যথেষ্ট সান্নিধ্যের মাধ্যমে, তাঁরা পরজন্মে বৃন্দাবনে গোপিকাবৃন্দ হয়েছিলেন এবং সেইখানে অবতীর্ণ নিত্যমুক্ত গোপিকাদের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁরা শ্রীমতী তুলসী দেবী অর্থাৎ শ্রীমতী বৃন্দাদেবীরও সান্নিধ্য অর্জন করেন। যজ্ঞানুষ্ঠানে নিয়োজিত ব্রাহ্মণদের পত্নীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত পুষ্পমাল্য ও পান সুপারি বিক্রেতা নারীদের সঙ্গে সান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা ভগবানের বিষয়ে নানা কথা শ্রবণ করতেন।

শ্লোক ৭

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৭ ॥

তে—তারা; ন—না; অধীত—পাঠ চর্চা করে; শ্রুতি-গণাঃ—বৈদিক শাস্ত্রাদি; ন—না; উপাসিত—উপাসনা করে; মহৎ-তমাঃ—মহা ঋষিগণ; অব্রত—ব্রত হীন; অতপ্ত—অভ্যাস না করে; তপসঃ—কৃচ্ছ্র সাধন; মৎ-সঙ্গাৎ—শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তদের সঙ্গে; মাম্—আমাকে; উপাগতাঃ—তারা লাভ করেছিল।

অনুবাদ

যে সকল মানুষদের বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছি, তারা মনোযোগ সহকারে বৈদিক শাস্ত্রাদি চর্চা করেনি, তারা মহা মুনিঋষিদেরও আরাধনা করেনি, কিংবা নিষ্ঠাভরে ব্রত সাধনাদিও করেনি। শুধুমাত্র আমার সঙ্গে এবং আমার ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গলাভের মাধ্যমে তারা আমাকে লাভ করেছিল।

তাৎপর্য

পূর্বে যেভাবে আলোচিত হয়েছে, সেইভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, শ্রুতিমন্ত্রাবলীর প্রবক্তা গুরুবর্গের অর্চনা, ব্রত-কৃচ্ছ্রতা উদ্‌যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতিসাধনের পদ্ধতির সহায়ক হয়ে থাকে। এই শ্লোকটিতে অবশ্য ভগবান পুনরায় বলেছেন যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীর সাথে সঙ্গলাভের অপরিহার্য্য পদ্ধতির কাছে ঐ সকল পদ্ধতিই গৌণ। অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের সুযোগ যেভাবে হয়ে থাকে, তা থেকেই যথার্থ জীবনের সার্থকতা অর্জন করা যায়। *মৎ-সঙ্গাৎ* শব্দটিকে একই ভাবার্থক *সৎ-সঙ্গাৎ* অর্থেও পাঠ করা চলে। *মৎ-সঙ্গাৎ* (আমার সঙ্গলাভ থেকে) শব্দটির মধ্যে, *মৎ* বলতে "আমার" অর্থাৎ ভক্তদেরও বোঝায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, শুদ্ধ ভক্ত তাঁর নিজের সাথেই সঙ্গলাভের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে অগ্রণী হতে পারেন, যেহেতু শুধুমাত্র তাঁর নিজেরই ক্রিয়াকর্ম এবং ভাবনামৃত আস্বাদনের সাথে নিত্য সঙ্গলাভের মাধ্যমে তিনি ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন।

শ্লোক ৮

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ৮ ॥

কেবলেন—অনন্য; হি—অবশ্য; ভাবেন—প্রেমভাবের দ্বারা; গোপ্যঃ—গোপীগণ; গাবঃ—বৃন্দাবনধামের গাভীগণ; নগাঃ—বৃন্দাবনের যমল অর্জুন বৃক্ষাদির মতো স্থাবর নিশ্চল জীবগণ; মৃগাঃ—অন্যান্য জীবগণ; যে—যারা; অন্যে—অন্য সকলে; মূঢ়-ধিয়ঃ—জড়বুদ্ধি; নাগাঃ—বৃন্দাবনের কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ; সিদ্ধাঃ—জীবনের

সার্থকতা অর্জন করে; মাম্—আমার প্রতি; ইয়ুঃ—তারা গিয়েছিল; অঞ্জসা—অতি সহজে।

অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবনধামের গোপীগণ, গাভীগণ, যমল অর্জুন বৃক্ষাদির মতো স্থাবর নিশ্চল প্রাণীগণ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লতাগুল্মসকল, এবং কালিয় প্রভৃতি সর্পেরা সকলেই আমার প্রতি অনন্য প্রেমের মাধ্যমে জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করেছিল এবং তার ফলে তারা অতি সহজে আমাকে লাভ করতে পেরেছিল।

তাৎপর্য

যদিও অগণিত জীব ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করেছিল, তা হলেও তাদের অনেকে কৃচ্ছ্র সাধন, ব্রতপালন, দানধ্যান, দার্শনিক চিন্তা অনুশীলন এবং বিবিধ উপায়ও অনুসরণ করেছিল। ইতিমধ্যেই আমরা পর্যালোচনা করেছি যে, সেই ধরনের পদ্ধতিগুলি নিতান্তই গৌণ বিষয়। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপিকাদের মতো অধিবাসীগণ একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই জানতেন না, এবং তাঁদের জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্যই ছিল শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা, যে বিষয়ে এখানে *কেবলেন হি ভাবেন* শব্দগুলির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। এমনকি গাছপালা, লতাগুল্ম এবং গোবর্ধনের মতো পাহাড় পর্বতও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসত। তাই ভগবান তাঁর ভ্রাতা বলদেবকে এই বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/১৫/৫) শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে—

অহো অমী দেববরামরার্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হণম্ ।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥

"হে প্রিয় ভ্রাতা বলদেব, কেবল লক্ষ্য করো এই যে বৃক্ষগুলি কিভাবে তাদের শাখা-প্রশাখা নিয়ে তোমার চরণকমলে নত হয়ে বন্দনা জানাচ্ছে, তারা সকলেই দেবতাদেরও পূজনীয়। হে প্রিয় ভ্রাতা, অবশ্যই তুমি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাই এই বৃক্ষগুলি তোমাকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে ফুল ও ফল উৎপন্ন করেছে। যদিও এরা বৃক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের তমোগুণের প্রভাবে, তা হলেও বৃন্দাবনধামে এমন সৌভাগ্যের জীবন লাভ করার ফলে, তারা তোমার শ্রীচরণকমলের সেবা নিবেদনের সুযোগ পেয়ে তাদের জীবনের সকল প্রকার তমসা নাশ করতে পেরেছে।"

যদিও বহু জীব নানাভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অর্জন করেছে, তবে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই সব কিছু বিবেচনার মাধ্যমে মনেপ্রাণে মর্যাদা দিয়েছে, তাঁরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই কারণে এই শ্লোকটিতে উল্লেখ করতে ভগবান দ্বিধা করেননি যে, মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমেও অনেকে তাঁদের জীবনে সার্থকতা অর্জন করেছেন, তবে তিনি বৃন্দাবন ধামের গোপীজন প্রমুখ অনন্য শুদ্ধ ভক্তদেরই গৌরবান্বিত করেছেন, কারণ তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিনা অন্য কিছুই জানতেন না। বৃন্দাবনবাসীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের আন্তরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে এমনই পরম তৃপ্তিসুখ লাভ করেছিলেন যে, তাঁরা মানসিক কল্পনা কিংবা সকাম কামনা-বাসনার মাধ্যমে তাঁদের প্রেমময় সেবা অনুশীলনের আচরণ কলুষিত করে তোলেন নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকারা মধুর রসের মাধ্যমে সেবা নিবেদন করেছিলেন, তবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বিশ্লেষণ অনুসারে গাভীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য রসের মাধ্যমে অর্থাৎ সন্তানাদির প্রতি পিতামাতার ভালবাসার মতো প্রেম নিবেদন করেছিল, কারণ গাভীগুলি নিয়তই শিশু কৃষ্ণের জন্য দুধ প্রদান করত। স্থাবর অর্থাৎ নিশ্চল পাহাড় পর্বত যেমন গোবর্ধন পর্বত এবং অন্যান্য পাহাড়-পর্বতগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের সখারূপে স্নেহ করত এবং বৃন্দাবনের অন্যান্য প্রাণীরা, গাছপালা ও লতাগুল্ম সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দাস্যরসে অর্থাৎ তাদের প্রভুরূপে ভালবাসত। কালিয়ের মতো সাপেরাও এইভাবে তাদের প্রভুর কাছে দাস্যরসে সেবার মনোভাব লাভ করেছিল এবং তারা সকলেই নিজ আলয়ে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, বৃন্দাবনধামের ঐ সমস্ত অধিবাসীদেরই নিত্যমুক্ত জীবরূপে গণ্য করা উচিত, যেকথা *সিদ্ধাঃ* শব্দটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে, অর্থাৎ তারা 'জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেছে'।

শ্লোক ৯

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥ ৯ ॥

যম্—যারা; **ন**—না; **যোগেন**—অলৌকিক আশ্চর্য যোগপদ্ধতির মাধ্যমে; **সাংখ্যেন**—দার্শনিক কল্পনার মাধ্যমে; **দান**—দানধ্যানের মাধ্যমে; **ব্রত**—ব্রতপালন; **তপঃ**—কৃচ্ছ্রতা; **অধ্বরৈঃ**—কিংবা বৈদিক যাগযজ্ঞাদির মাধ্যমে; **ব্যাখ্যা**—অন্য সকলকে বৈদিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনিয়ে; **স্বাধ্যায়**—বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়নে নিজের প্রচেষ্টা;

সন্ন্যাসৈঃ—কিংবা সন্ন্যাস জীবন যাপনের মাধ্যমে; প্রাপ্নুয়াৎ—অর্জন করতে পারে; যত্নবান্—প্রচুর অধ্যবসায়ে; অপি—তা সত্ত্বেও।

অনুবাদ

যদি কেউ প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে অলৌকিক যোগচর্চা, দার্শনিক চিন্তাভাবনা, দানধ্যান, ব্রতাদি পালন, কৃচ্ছ্র সাধন, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, সকলকে বৈদিক মন্ত্রাবলী শিক্ষাদান, বৈদিক শাস্ত্রাদি স্বাধ্যায় চর্চা, কিংবা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনধারা অনুশীলনও করে, তবুও আমাকে লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পন্থায় কেউ যদি বিশেষ নিষ্ঠা সহকারেও প্রয়াসী হয়, তা সত্ত্বেও তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করা কারও পক্ষেই সহজসাধ্য হয় না। গোপিকাগণ ও গাভীকুলের মতো বৃন্দাবনবাসীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে সদাসর্বদাই বাস করতেন, এবং তাই তাঁদের সেই প্রকার সান্নিধ্যকে *সৎসঙ্গ* বলা হয়েছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সাথে অন্তরঙ্গভাবে কেউ বসবাস করলে সে সৎ, অর্থাৎ নিত্যসত্তা সম্পন্ন হয়ে যায়, এবং তেমন কারও সাথে সঙ্গলাভ হলে তা অন্যজনকেও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সুফল অর্জনে সহায়তা করে থাকে। চান্দ্রায়ণ ব্রত নামে এক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন চন্দ্রকলা হ্রাসের সঙ্গে এক গ্রাস করে অন্ন-আহারাদি গ্রহণও হ্রাস করতে হয় এবং সেইভাবেই চন্দ্রকলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আহার বৃদ্ধি করা অভ্যাস করা হয়। তেমনই, সংস্কৃত বৈদিক মন্ত্রাবলীর কঠোর চর্চা এবং শিক্ষাদান ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পরিশ্রমসাধ্য উদ্যোগের মাধ্যমেও অনেকে বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। তবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের অহৈতুকী কৃপা লাভ না করতে পারলে এই সমস্ত কঠোর পরিশ্রমসাধ্য উদ্যোগের মাধ্যমেও জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা লাভ করা যায় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১/২/৮) প্রথম স্কন্ধের শ্লোকেই বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

"পরমেশ্বর ভগবানের বাণীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে না পারলে, মানুষের সকল প্রকার ধর্মসম্মত অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম সবই পণ্ডশ্রম হয় মাত্র।

শ্লোক ১০

রামেণ সার্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।

বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায় ॥ ১০ ॥

রামেণ—বলরামের সাথে; **সার্ধম্**—সঙ্গে; **মথুরাম্**—মথুরা নগরীতে; **প্রণীতে**—যখন আনা হয়েছিল; **শ্বাফল্কিনা**—অক্রূরের সাথে; **ময়ি**—আমার; **অনুরক্ত**—নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; **চিত্তাঃ**—যাদের মন হয়েছিল; **বিগাঢ়**—অতি গভীর; **ভাবেন**—প্রেমভাবের দ্বারা; **ন**—না; **মে**—আমার চেয়েও; **বিয়োগ**—বিরহে; **তীব্র**—গভীর; **আধয়ঃ**—যারা মানসিক বিরহ, উদ্বেগ ভোগ করছিল; **অন্যম্**—অন্যেরা; **দদৃশুঃ**—তাঁরা দেখেছিলেন; **সুখায়**—যাতে তাঁদের সুখ অনুভব হত।

অনুবাদ

গোপীজন প্রমুখ বৃন্দাবনবাসীরা গভীর প্রেমবন্ধনে আমার প্রতি সম্পূর্ণ আসক্ত হয়েছিলেন। তাই, যখন আমার পিতৃব্য অক্রূর আমার ভাই বলরাম এবং আমাকে মথুরা নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন বৃন্দাবনবাসীরা আমার বিরহে গভীর মনোকষ্ট পেয়েছিলেন এবং অন্য কোনও ভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি বিশেষভাবে বৃন্দাবনধামের গোপবালিকাদের মনোকষ্ট বর্ণনা করেছে, এবং তাঁদের অতুলনীয় প্রেম তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকাশ করেছেন। দশম স্কন্ধে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রূরকে রাজা কংস বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল এবং কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে মথুরায় এক মল্লক্রীড়ায় উপস্থিত হতে পরামর্শ দিয়েছিল। গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে এমনই মগ্ন হয়েছিল যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁদের চেতনা সম্পূর্ণভাবে চিন্ময় প্রেমভাবে পরিণত হয়েছিল। তাই তাঁদের কৃষ্ণভাবনাকে জীবনের সর্বোত্তম সিদ্ধিরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাঁরা নিত্যনিয়ত আশা করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসুর নিধনের কাজ সম্পূর্ণ করেই তাঁদের কাছে ফিরে যাবেন, এবং তাই তাঁদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রবল চাঞ্চল্যকর হৃদয়বিদারক প্রেমের অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছিল। যথার্থ সুখের অভিলাষী সকলকেই এইভাবে গোপীদের মতোই পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে সবকিছু বর্জনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শ্লোক ১১

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ ।

ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

তাঃ তাঃ—সেই সকল; ক্ষপাঃ—রাত্রিগুলি; প্রেষ্ঠ-তমেন—সকলের প্রিয়তম; নীতাঃ—অতিবাহিত; ময়া—আমার সঙ্গে; এব—অবশ্য; বৃন্দাবন—বৃন্দাবন ধামে; গোচরেণ—কে জানে; ক্ষণ—মুহূর্ত; অর্ধ-বৎ—অর্ধেকের মতো; তাঃ—সেই রাত্রিগুলি; পুনঃ—আবার; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; তাসাম্—গোপিকাদের কাছে; হীনাঃ—অভাব; ময়া—আমার; কল্প—ব্রহ্মার একটি দিন (৪,৩২,০০,০০,০০০ বছর) সমাঃ—সম পরিমাণ; বভূবুঃ—হয়েছিল।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব, শ্রীবৃন্দাবন ধামে গোপিকাগণ তাদের পরম প্রিয়তমরূপে আমাকে পেয়ে যে রাত্রিগুলি অতিবাহিত করেছিল, সেইগুলি সবই তাদের কাছে ক্ষণার্ধের মতোই মনে হয়েছিল। অবশ্যই, আমার সঙ্গবিহনে গোপিকাগণ ঐ রাত্রিগুলিকেই ব্রহ্মার এক-একটি দিনের মতোই সুদীর্ঘকাল মনে করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই বিষয়ে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপিকাগণ চরম উৎকণ্ঠা ভোগ করছিলেন, এবং আপাতদৃষ্টিতে যদিও তাঁদের বিভ্রান্ত মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সমাধি ভাবের পরম সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের সকল চেতনা-ভাবনাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই ধরনের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে তাঁদের শরীরগুলি যেন তাঁদের কাছ থেকে বহু বহু দূরে চলে গিয়েছিল, যদিও মানুষ সাধারণত তার শরীরটিকে নিজেরই আয়ত্তে আছে বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, গোপিকাগণ তাঁদের নিজেদের অস্তিত্বের কথাই চিন্তা করেননি। যদিও যে কোনও যুবতী সাধারণত তাঁর পতিপুত্রদেরই সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু গোপিকারা তাঁদের পরিবার পরিজন বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই মানেননি। তাঁরা ইহকাল বা পরকালের কথাও চিন্তা করেননি। অবশ্যই তাঁরা এই সব বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। মহান ঋষিরা যেভাবে জড়জগতের নাম ও রূপাদি থেকে নির্বিকল্প অর্জন করেন, গোপীগণও সেইভাবে অন্য কোনও কিছুই চিন্তাভাবনা করতে পারেননি, কারণ তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রেমাচ্ছন্ন স্মরণ চিন্তায় ভাবাবিষ্ট হয়েই ছিলেন। যেভাবে নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, গোপিকারাও সেইভাবে অনন্য প্রেমাবেশের মাধ্যমে তাঁদের সকল চেতনা সত্তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে একাকার করে দিয়েছিলেন।"

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিকাদের মাঝে বিরাজিত হয়েছিলেন, তখন এক-একটি মুহূর্তের মতোই ব্রহ্মার এক-একটি দিন যেন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুপস্থিত ছিলেন, তখন এক-একটি মুহূর্তই ব্রহ্মার সুদীর্ঘ এক-একটি দিন বলে তাঁদের কাছে মনে হত। গোপিকাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের স্বরূপ পারমার্থিক দিব্য জীবনধারার চরম সার্থকতার পরিচয় এবং সেই সার্থকতার লক্ষণগুলিই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

তা নাবিদন্ ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্ ।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ ১২ ॥

তাঃ—তাঁরা (গোপিকাগণ); ন—না; অবিদন্—জানতেন; ময়ি—আমাকে; অনুসঙ্গ—অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে; বদ্ধ—আবদ্ধ; ধিয়ঃ—তাঁদের চেতনা; স্বম্—তাঁদের নিজেদের; আত্মানম্—দেহ বা আত্মা; অদঃ—দূরবর্তী কিছু; তথা—সেইভাবে মনে করে; ইদম্—এই যেটি অতি নিকট; যথা—যেমন; সমাধৌ—যোগসমাধির মধ্যে; মুনয়ঃ—মহামুনিগণ; অব্ধি—সমুদ্রের; তোয়ে—জলের মধ্যে; নদ্যঃ—নদীগুলি; প্রবিষ্টাঃ—প্রবেশ করার পরে; ইব—যেন; নাম—নামাদি; রূপে—এবং রূপাদি।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, মহামুনিগণ যেভাবে যোগমগ্ন হয়ে, সমুদ্রে সমস্ত নদীর মিলিত হওয়ার মতো একাকার হয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন, এবং জড়জাগতিক নাম ও রূপাদি সম্পর্কে সচেতন থাকেন না, তেমনভাবেই, বৃন্দাবনের গোপিকাগণও তাঁদের মনঃসংযোগের মাধ্যমে আমার প্রতি এমনই একাত্মভাবে আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা এই জগতের সম্পর্কে এমনই নির্বিকার হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের শরীরের কথা, কিংবা এই জগতের কথা, কিংবা তাঁদের পরকালের কথাও চিন্তা করতে পারেননি। তাঁদের সমগ্র চেতনা একাত্মভাবেই আমার মাঝে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

স্বম্ আত্মানম্ অদস্ তথেদম্ শব্দসমষ্টির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, সাধারণ মানুষদের আপন শরীর তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকট-সম্বন্ধ ও পরম প্রিয় বিষয় হলেও, গোপিকারা তাঁদের নিজেদের শরীরগুলিকে বহুদূর সম্পর্কিত বিষয় বলে

মনে করতেন, ঠিক যেভাবে সমাধিমগ্ন কোনও যোগী পুরুষ তাঁর শরীরটিকে কিংবা তাঁর শরীরের চারদিকে সাধারণ সব কিছুকেই বহুদূরবর্তী বিষয়াদির মতোই মনে করতে থাকেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে তাঁর বাঁশিটি বাজাতেন, তখন গোপিকারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের স্বামী-সন্তানাদি বলতে যাদের বোঝায়, তাদের সকলের কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে নৃত্য করার উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে চলে যেতেন। এই সমস্ত বিতর্কিত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিরচিত *লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূল ব্যাখ্যা হল এই যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর উৎস, এবং গোপিকারা ভগবানেরই শক্তিপ্রকাশ। তাই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তাঁর আপনার উদ্ভাসিত শক্তিস্বরূপা গোপিকাগণ, যাঁরা ভগবানের সৃষ্টির মাঝে পরমা সুন্দরী যুবতী বালিকা রূপেই বিদ্যমানা, তাঁদের সাথে ভগবানের প্রেমলীলায় কোনই বৈসাদৃশ্য কিংবা নীতিবিগর্হিত ঘটনা ঘটেনি।

গোপিকাদের মনেও কোনও বিভ্রান্তি ছিল না, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁরা এমনই আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন যে, তাঁরা অন্য কোনও কথা চিন্তা করার কথাই মনে করেননি। যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্য বিরাজ করে থাকে, তাই ভগবানের চিন্তায় গোপিকাগণ একাগ্রভাবে মনপ্রাণ সন্নিবদ্ধ করার ফলে তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি। গভীর প্রেমের স্বরূপ এই রকমই হয় যে, প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্য সকল বিষয়াদি চিন্তাবহির্ভূত হয়ে যায়। তবে, জড়জগতে, যেখানে আমরা আমাদের জাতি, দেশ, পরিবারবর্গ কিংবা আপন শরীরটাকেই সীমিত অস্থায়ী বিষয়বস্তুর মতো ভালবাসতে চেষ্টা করি, তখন অন্য সব কিছুর প্রতি অবহেলা করা যেন নির্বুদ্ধিতা বলেই মনে হতে থাকে। কিন্তু যখন আমাদের প্রেম ভালবাসা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে সবকিছুর উৎস বিবেচনা করে তাঁর প্রতি একাগ্রভাবে নিবিষ্ট হয়, তখন সেই নিবিষ্টতাকে অজ্ঞতা কিংবা সঙ্কীর্ণমনের পরিচয় বলা চলে না।

একটিমাত্র বিষয়বস্তুর প্রতি অনন্যভাবে মনঃসংযোগের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যেই এখানে সমাধিমগ্ন মুনিঋষিদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। নতুবা, গোপিকাদের ভাবোল্লাসপূর্ণ ভগবৎ প্রেম এবং যে সমস্ত যোগীঋষিরা শুধুমাত্র উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে যে, তাদের জড়জাগতিক শরীরটাই তাদের প্রকৃত সত্তা নয়, তাদের শুষ্ক ধ্যানমগ্নতার কোনও তুলনা হয় না। যেহেতু পরম তত্ত্বের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার মতো কোনও শরীর গোপিকাগণ ধারণ করেননি এবং তাঁরা পরমতত্ত্বকেই আলিঙ্গন করে নৃত্যরতা হয়েছিলেন, তাই গোপিকাদের সমুন্নত

ভাবমর্যাদার সঙ্গে সামান্য যোগীদের তুলনা কখনই কেউ করতে পারে না। বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্মসুখের উপলব্ধির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দসাগরের একটিমাত্র অণুকণারও তুলনা করা চলে না। অন্তরঙ্গ আসক্তি যেন কঠিন রজ্জুর মতোই দেহ এবং মনকে দৃঢ়বদ্ধ করে রাখে। জড়জাগতিক জীবনধারায় আমরা যা কিছু অনিত্য অস্থায়ী এবং মায়াময়, তার মাঝেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি এবং তাই অন্তরকে সেই বন্ধনের মাঝে বিপুল বেদনা সইতে হয়। অবশ্য, আমরা যদি নিত্যসত্তা স্বরূপ, সকল সুখ, আনন্দ ও সৌন্দর্যের উৎস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে আমাদের সকলের মন এবং অন্তরের বন্ধন সৃষ্টি করি, তা হলে আমাদের সকলের হৃদয় দিব্য আনন্দ সাগরের মাঝে অনন্তরূপে বিস্তার লাভ করবে।

আমাদের বোঝা উচিত যে, নির্বিশেষ নিরাকার ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে যেভাবে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিতত্ত্বের বাস্তবতা অস্বীকার করা হয়ে থাকে, গোপিকাগণ কোনও মতেই সেই ধরনের নির্বিশেষ চিন্তায় আগ্রহী ছিলেন না। গোপিকাগণ কোনও কিছুই অগ্রাহ্য করেননি; তাঁরা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই ভালবেসে ছিলেন এবং অন্য কোনও কিছুই চিন্তা করতে পারেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হতে যা কিছু বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেছিল, তাঁরা শুধুমাত্র সেইগুলিকেই পরিহার করেছিলেন, এমন কি তাঁদের নিজেদের চোখের পলক ফেলার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, যেহেতু ক্ষণকালের জন্য চোখের পলক ফেলতে গিয়ে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দৃষ্টিপথ থেকে হারাতে চাননি। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, সমস্ত একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণেরও নিজ আলয়ে তথা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের অগ্রগামী দৃঢ় পদক্ষেপে যাতে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি না হয়, তাদের জীবনধারা থেকে সেই সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাহস সঞ্চয় করতেই হবে।

শ্লোক ১৩

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥

মৎ—আমাকে; **কামাঃ**—যারা কামনা করে; **রমণম্**—মনোলোভা প্রেমিক; **জারম্**—অন্যের স্ত্রীর প্রেমিক; **অস্বরূপ-বিদঃ**—আমার যথার্থ স্বরূপ না জেনে; **অবলাঃ**—নারীগণ; **ব্রহ্ম**—পরম; **মাম্**—আমাকে; **পরমম্**—পরম; **প্রাপুঃ**—তারা লাভ করে; **সঙ্গাৎ**—সঙ্গ মাধ্যমে; **শতসহস্রশঃ**—শত সহস্র জনে।

অনুবাদ

সেই সমস্ত শতসহস্র গোপীরা আমাকে তাঁদের পরম রমণীয় প্রেমিকরূপে আকাঙ্ক্ষা করার ফলে আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিলেন। তবুও

আমার সাথে একান্তভাবে সঙ্গলাভের মাধ্যমেই গোপিকাগণ আমাকে পরমতত্ত্বরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

অস্বরূপবিদঃ (আমার যথাযথ মর্যাদা ও স্বরূপ উপলব্ধি না করে) শব্দসমষ্টির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রমণীয়া গোপিকাগণ এমনই একাত্মভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে মধুর প্রেমরসে পরিপূর্ণ মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান রূপে তাঁর অনন্ত ঐশ্বরিক শক্তিমত্তা কিছুই উপলব্ধি করতে পারেননি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *অস্বরূপবিদঃ* শব্দসমষ্টির এই ব্যাখ্যাটি ছাড়াও অন্যরূপ অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় *বিদ্* শব্দটির অন্য একটি অর্থ "অর্জন করা"। তাই, *অস্বরূপবিদঃ* বলতে বোঝায় যে, অন্যান্য ভগবদ্ভক্তজনের মতোই গোপিকাগণও *সারূপ্যমুক্তি* অর্থাৎ ভগবানের মতোই দেহরূপ লাভের মুক্তি অর্জন করতে আগ্রহী নন। গোপিকারা যদি ভগবানের মতোই দেহরূপ অর্জন করতেন, তা হলে কেমন করে ভগবান গোপিকাদের সাথে নৃত্যকলার মাধ্যমে তাঁদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তাঁর মাধুর্যময় লীলাবিলাস করতে পারতেন? যেহেতু গোপিকারা ভগবানের সেবিকারূপে তাঁদের নিত্য চিন্ময় রূপ যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই *স্বরূপ* শব্দটি তাঁদের নিজেদের চিন্ময় দিব্য রূপের অভিব্যক্তিও বোঝায়, এবং তাই *অস্বরূপবিদঃ* শব্দটি বোঝায় যে, জড়বাদীরা যেভাবে নিজেদের শরীরের রূপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে থাকে, গোপিকাগণ কখনও তা ভাবতেন না। যদিও গোপিকারা ভগবানের সৃষ্টি মহিমার মাঝে অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকাদের মতোই রূপ লাবণ্য ধারণ করেছিলেন, তবু তাঁরা কখনই নিজেদের শরীরের রূপ নিয়ে এতটুকুও চিন্তাভাবনা করতেন না, বরং তাঁরা নিয়তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যশরীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। যদিও গোপিকাদের সমুন্নত মাধুর্য রসানুভূতি আমরা অনুকরণ করতে পারি না, তবু আমরা বাস্তব জগতে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পরম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অবশ্যই পারি। গোপিকাগণ স্বভাবসিদ্ধ মধুর রসানুভূতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের পরম সার্থকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪-১৫

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্ ।
প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥ ১৪ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্ ।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ত্বম্**—তুমি; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ কর; **চোদনাম্**—বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি; **প্রতিচোদনাম্**—আনুষঙ্গিক বৈদিক শাস্ত্রাদির অনুশাসনগুলি; **প্রবৃত্তিম্**—অনুশাসনাদি; **চ**—এবং; **নিবৃত্তিম্**—নিষেধাত্মক; **চ**—ও; **শ্রোতব্যম্**—শ্রবণযোগ্য; **শ্রুতম্**—যা শোনা হয়েছে; **এব**—অবশ্য; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **একম্**—একমাত্র; **এব**—বস্তুত; **শরণম্**—আশ্রয়; **আত্মানম্**—অন্তরস্থ পরমাত্মা; **সর্ব-দেহিনাম্**—সকল বদ্ধ জীবাত্মার; **যাহি**—তুমি অবশ্যই যাবে; **সর্ব-আত্ম-ভাবেন**—সর্বাত্মক ভক্তিভাবে; **ময়া**—আমার কৃপা বলে; **স্যাঃ**—তোমার উচিত; **হি**—অবশ্যই; **অকুতঃ-ভয়ঃ**—সর্ব বিষয়ে নির্ভয় হয়ে।

অনুবাদ

সুতরাং, হে প্রিয় উদ্ধব; বৈদিক মন্ত্রাবলী তথা বৈদিক শাস্ত্রাদির আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি এবং সেগুলির অন্তর্গত নেতিবাচক ও ইতিবাচক অনুশাসনাদি সবই বর্জন কর। যা কিছু শ্রবণযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণ করেছ, সবই পরিত্যাগ কর। শুধুমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, কারণ সকল বদ্ধ জীবের অন্তরে অবস্থিত আমিই পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান। সর্বাত্মক ভক্তিভরে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, এবং আমারই কৃপাবলে সর্ববিষয়ে নির্ভয় লাভ কর।

তাৎপর্য

উদ্ধব সাধুপুরুষ এবং মুক্তাত্মা পুরুষদের লক্ষণাদি সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এবং ভগবান পারমার্থিক উন্নতি বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং যারা প্রেমময় ভগবদ্ভক্তরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করার ফলে ভগবদ্প্রেমের মাধ্যমে তাঁকে জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের সাহায্যে উত্তর প্রদান করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর প্রতি প্রেমভাবাপন্ন ভক্তবৃন্দের আকর্ষণে এবং সেই ভক্তবৃন্দের আন্তরিক সঙ্গীদেরও আকর্ষণে তিনি আবিষ্ট হয়ে থাকেন। সকল ভক্তবৃন্দের মধ্যে, বৃন্দাবনের গোপিকাদেরই ভগবান দুর্লভ প্রেমভক্তিভাব অর্জনে সক্ষম বলে বর্ণনা করেছেন এবং তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছে নিজেকে ঋণী বলেই মনে করে থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে গোপিকাদের প্রেমভাব তাঁর অন্তরে গোপন করে রেখেছিলেন, কারণ সেই প্রেমভাবের ঐকান্তিকতা এবং ভগবানের আপন ভাবগাম্ভীর্য তার অভিপ্রকাশ ঘটতে দেয়নি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের অন্তরঙ্গ প্রেম সম্পর্কে আর নীরব হয়ে থাকতে পারেননি, এবং তাই এই

শ্লোকগুলির মাধ্যমে উদ্ধবকে ব্যক্ত করে বৃন্দাবনধামে গোপিকাগণ তাঁকে কিভাবে প্রেমভক্তি অর্পণ করেছিলেন, এবং তাঁরা কিভাবে সম্পূর্ণভাবে তাঁকে আয়ত্ত করেছিলেন, তা প্রকাশ করেছেন। ভগবান প্রেমময়ী গোপিকাদের সঙ্গে গোপন স্থানে বিহার করতেন, এবং স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্যময় আসক্তির মাধ্যমে তাঁদের মাঝে মহত্তম প্রেম বিনিময় হত।

ভগবান তাই *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করেছেন, শুধু মাত্র জড় জগতে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই কিংবা মামুলি, সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মাচরণ পালন করলেই কেউ তার জীবনে সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের যথার্থ পরিচয় যথার্থভাবে উপলব্ধি করা চাই, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভের মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ সত্তাকে ভালবাসার পদ্ধতি অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই ভগবৎ-প্রেম মাধুর্য, বাৎসল্য, সখ্য কিংবা দাস্য ভাবরস তথা বিভিন্ন সম্বন্ধের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে। ভগবান বিস্তারিতভাবে উদ্ধবকে জড় জগতের দার্শনিক বিশ্লেষণের পদ্ধতি বুঝিয়ে বলেছেন, এবং এখন তিনি সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন যে, উদ্ধবের পক্ষে সকাম কার্যকলাপে কিংবা মানসিক কল্পনার মাধ্যমে সময় নষ্ট করার কোনই দরকার নেই। বস্তুত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আভাস প্রদান করেছেন যে, উদ্ধব যেন, গোপিকাদের দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং ব্রজধামের গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যেন সচেষ্ট হন। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ভারগ্রস্ত জড়া প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মনীতির মাঝে অতৃপ্ত যে কোনও বদ্ধ জীবেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক জীবনধারার সমস্যাদি থেকে সমস্ত জীবকুলকেই উদ্ধার করতে পারেন। তার কাউকেই অযথা, সাম্প্রদায়িক যাগযজ্ঞাদি, অনুশাসনাদি কিংবা বিধিনিষেধের মাঝে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রাখার কোনই প্রয়োজন হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত অনুসরণের মাধ্যমে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করাই মানুষের উচিত। প্রামাণ্য সুপরিকল্পিত ভক্তিযোগ প্রথার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অনুশীলন করলে অনায়াসেই মানুষ পারমার্থিক জীবনের সার্থকতা অর্জন করে থাকে।

শ্লোক ১৬

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সংশয়ঃ শৃণ্বতো বাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর ।
ন নিবর্ততে আত্মস্থো যেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—উদ্ধব বললেন; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণকারীর; **বাচম্**—কথা; **তব**—আপনার; **যোগ-ঈশ্বরঃ**—যোগশক্তির ঈশ্বরগণের; **ঈশ্বর**—আপনি তাঁদের ঈশ্বর; **ন নিবর্ততে**—দূরীভূত হয় না; **আত্ম**—হৃদয়ে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **যেন**—যার দ্বারা; **ভ্রাম্যতি**—বিভ্রান্ত; **মে**—আমার; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে সকল যোগেশ্বরের পরমেশ্বর, আপনার বাণী আমি শ্রবণ করেছি, কিন্তু আমার অন্তরের বিভ্রান্তি এখনও দূর হয়নি; তাই আমি এখনও সন্দেহাকুল হয়ে রয়েছি।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিতে, ভগবান বলেছেন যে, তাঁরই আশ্রয় গ্রহণ করা সকলের উচিত এবং সর্ব প্রকার জড়জাগতিক বাসনা বর্জন করে বর্ণাশ্রম প্রথার মাধ্যমে নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করা কর্তব্য। উদ্ধব এই উক্তিটিকে কর্মমিশ্রা ভক্তি, অর্থাৎ সকাম কর্মের প্রবণতা মিশ্রিত ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পন্থারূপে ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবিকই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সবকিছু, এই তত্ত্ব উপলব্ধি না হলে জড়জাগতিক সাধারণ কর্তব্যকর্মের প্রবণতা থেকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। তার চেয়ে বরং সেই ধরনের ক্রিয়াকর্মের সকল ফলশ্রুতি ভগবানের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে, ভগবান পরামর্শ দিয়েছেন যে, জাগতিক কর্তব্যকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠা সহকারে যথার্থ জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁকেই পরমেশ্বর রূপে স্বীকার করা কর্তব্য। উদ্ধব এই উপদেশটিকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনের গৌণ বাসনা মিশ্রিত ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন রূপে উপলব্ধি করেছেন। দশম অধ্যায়ের ৩৫ সংখ্যক শ্লোকটি থেকে শুরু করে, উদ্ধব জড়জাগতিক বদ্ধতার প্রক্রিয়া এবং জড়জাগতিক জীবনধারা থেকে মুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন। ভগবান বিশদভাবে সেই বিষয়ে উত্তর প্রদান করে বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিমূলক সেবা অনুশীলন ছাড়া দার্শনিক কল্পনার প্রক্রিয়া কখনই সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। একাদশ অধ্যায়ের ১৮ সংখ্যক শ্লোকটিতে ভগবান বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন, এবং ২৩ সংখ্যক শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিষয়ে তাঁর আলোচনা বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন যাতে গুরুত্ব সহকারে বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে

মানুষকে ভগবৎ-বিশ্বাসী হতে হবে। ভগবান সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিকাশ ও সার্থকসিদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই ভগবদ্ভক্তজনের সান্নিধ্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। একাদশ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে উদ্ধব ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের যথার্থ পন্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সার্থকসিদ্ধি লাভের লক্ষণাদি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন। আর ৪৮ সংখ্যক শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যদি ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের প্রক্রিয়া গ্রহণ না করে, তবে তার পক্ষে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গ অবশ্যই লাভ করা চাই এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। অবশেষে, এই অধ্যায়ের ১৪ সংখ্যক শ্লোকটিতে অবিসম্বাদিতভাবে ভগবান ফলাশ্রয়ী সকাম কর্ম প্রচেষ্টা ও মানসিক জল্পনা-কল্পনার পথ বর্জন করেছেন এবং ১৫ সংখ্যক শ্লোকে তিনি অনুমোদন করেছেন যে, সর্বান্তঃকরণে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এই ধরনের বিশদ এবং তত্ত্বপ্রধান উপদেশাবলী গ্রহণের পরে, উদ্ধব বিভ্রান্ত হন, এবং তিনি বাস্তবিক কি করবেন, সেই বিষয়ে তাঁর মন সন্দেহাকুল হয়ে ওঠে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়াগুলির ফলাফলও বর্ণনা করেছেন, যেগুলি সবই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখেই শেষ পর্যন্ত একটি লক্ষ্যে উপনীত হয়ে থাকে। সুতরাং উদ্ধব বাসনা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহজ সরলভাবে যেন কিছু বর্ণনা করেন; *ভগবদ্গীতার* তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই অর্জুনও একই প্রকার অনুনয় ভগবানের কাছে উপস্থাপন করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে, উদ্ধব এখানে বলেছেন, "হে প্রিয় সখা কৃষ্ণ, প্রথমে আপনি পরামর্শ দিলেন যে, আমি যেন বর্ণাশ্রম প্রথামতো জাগতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করতে অভ্যস্ত হতে পারি, এবং তার পরে আপনি উপদেশ দিলেন যেন আমি সেই সকল কার্যকলাপ পরিহার করি এবং দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক পন্থা গ্রহণ করি। এখন জ্ঞানমার্গ বর্জনের পরে, আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন আমি শুধুমাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করি। যদি আপনার সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করি, তা হলে ভবিষ্যতে হয়তো আপনি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্তে ফিরে যেতেও পারেন এবং জড়জাগতিক কাজকর্মের পরামর্শই দিতে পারেন।" সাহসিকতার সঙ্গে উদ্ধব তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার মাধ্যমে, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্যতার ভাব অভিব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ
প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং
মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন; সঃ এষঃ—তিনি স্বয়ং; জীবঃ—পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সকলকে জীবন দান করেন; বিবর—অন্তর মাঝে; প্রসূতিঃ—প্রকাশিত; প্রাণেন—প্রাণবায়ুর সাথে; ঘোষেণ—শব্দের সূক্ষ্ম অভিব্যক্ত সহ; গুহাম্—অন্তঃকরণ; প্রবিষ্টঃ—যিনি প্রবেশ করেছেন; মনঃ-ময়ম্—মনের মাঝে অনুভূত, কিংবা দেবাদিদেব শিবের মতো মহান দেবতাগণেরও মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে; সূক্ষ্মম্—সূক্ষ্ম; উপেত্য—অবস্থিত হয়ে; রূপম্—রূপ; মাত্রা—কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন মাত্রা; স্বরঃ—বিভিন্ন উচ্চারণভঙ্গী; বর্ণঃ—বর্ণমালার বিভিন্ন শব্দ; ইতি—এইভাবে; স্থবিষ্ঠঃ—স্থূল রূপ।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান বললেন—হে প্রিয় উদ্ধব, পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেক জীবকে প্রাণ দেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে প্রাণবায়ু ও শব্দকম্পন সহকারে অবস্থান করে থাকেন। মনের সাহায্যে প্রত্যেকেরই অন্তরে ভগবানকে তাঁর সূক্ষ্ম রূপে উপলব্ধি করা যায়, যেহেতু দেবাদিদেব শিবের মতো মহান দেবতাদেরও মনের মধ্যে এবং সকলের মনের মধ্যে অবস্থান করে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বৈদিক শাস্ত্রাদির বিভিন্ন শব্দের মধ্যে দীর্ঘ এবং হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন স্বরমাত্রায় পরমেশ্বর ভগবান রূপ লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উদ্ধবের মধ্যে বাক্যালাপ সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নরূপ মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। উদ্ধব বিভ্রান্ত হয়ে সন্দিগ্ধ বোধ করেছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু বিভিন্ন পদ্ধতি, যথা—ভক্তিসেবা অনুশীলন, কল্পনাভিত্তিক জ্ঞান অনুশীলন, সন্ন্যাস গ্রহণ, অলৌকিক যোগাভ্যাস; দানধ্যানের কৃচ্ছ্রতা পালন, পুণ্যব্রত সাধন, এবং আরও নানা বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। অবশ্য, এই সকল প্রক্রিয়াই জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভের সহায়তার জন্য বিহিত হয়েছিল এবং বাস্তবিকই কোনও বৈদিক পদ্ধতিকেই এছাড়া অন্য

কোনও ভাবে উপলব্ধি করা উচিত নয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাটিকেই বর্ণনা করে দিয়েছিলেন যথাযথ অনুক্রম অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়বোধ করেছিলেন যে, উদ্ধব যেন বুদ্ধিহীনের মতো ভেবেছিলেন যে, তাঁকে বুঝি প্রত্যেকটি পদ্ধতি অভ্যাস করতে হবে, যেন প্রত্যেকটি পদ্ধতি কেবলমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, "হে প্রিয় উদ্ধব, যখন আমি তোমাকে বললাম যে, বিশ্লেষণমূলক বিদ্যা অভ্যাস করতে হবে, পুণ্য কাজ অনুশীলন করতে হবে, ভগবদ্ভক্তিসেবা বাধ্যতামূলক, যোগ পদ্ধতি অবশ্যই পালন করতে হবে, ব্রত কৃচ্ছ্রাদি পালন করতে হবে, ইত্যাদি, তখন তোমাকে আমার দর্শক মনে করে সেই সবই সমস্ত জীবকুলকেই শোনাচ্ছিলাম। যা কিছু আমি বলেছি, এখন বলছি এবং ভবিষ্যতেও বলব, বুঝতে হবে তা সবই আমি বিভিন্ন অবস্থায় সকল জীবের পথনির্দেশের জন্যই বলছি। কেমন করে তুমি মনে করতে পারলে যে, বৈদিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয়গুলি সবই তোমাকে অভ্যাস করতে হবে? তোমাকে এখন আমার শুদ্ধ ভক্তরূপে স্বীকার করছি। তোমাকে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সব কিছু পালন করতে হবে না।" এই ভাবে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমতে, ভগবান সহজভাবে এবং উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় বৈদিক পদ্ধতি বৈচিত্র্যের পেছনে গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্ধবকে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেদরাশির রূপ গ্রহণ করে ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। এই শ্লোকের মধ্যে *বিবর-প্রসৃতি* শব্দটিও বোঝায় যে, ব্রহ্মার শরীর মধ্যে অবস্থিত *আধারাদিচক্রস্* মধ্যেও ভগবান বিরাজিত আছেন। *ঘোষেণ* শব্দটির অর্থ "সূক্ষ্ম শব্দ", এবং *গুহাং প্রবিষ্টঃ* শব্দসমষ্টিও বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *আধারচক্র* মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। ভগবানকে অন্যান্য চক্রাদির মধ্যেও উপলব্ধি করা যেতে পারে, যেমন—*মণিপুরক চক্র*, যা নাভির চতুর্দিকে অবস্থিত, এবং *বিশুদ্ধচক্র*। সংস্কৃত বর্ণমালা হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণেরও উচ্চ এবং নিম্নধ্বনি অনুসারে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এই সকল ধ্বনি কম্পন কাজে লাগিয়ে বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মোটামুটি সার্বিক রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে, এই সকল শাস্ত্রাদি অধিকাংশই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণাবলী সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছে—*ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন* (*গীতা* ২/৪৫) শ্রীল শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, মায়ার অধীনস্থ হয়ে থাকার ফলেই পরমেশ্বর ভগবানকে বদ্ধ জীবেরা জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই অংশ বলে মনে করে। পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে

ধারণা গঠনে কিছু স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়জাগতিক গুণাবলীর কাল্পনিক আরোপ করার নাম *অবিদ্যা*, অর্থাৎ অজ্ঞানতা, এবং সেই ধরনের অজ্ঞতা তথা অজ্ঞানতার ফলেই জীবমাত্রেই নিজেকে তার সকল ক্রিয়াকলাপেরই কর্তা বলে বিবেচনা করে থাকে এবং তাই কর্মবন্ধনের জালে বিজড়িত হয়ে পড়ে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের কর্মবন্ধনজালে আবদ্ধ জীবাত্মাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তার জীবনচর্যা পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক অনুশাসনাদি পালন করতে হয়। এই প্রক্রিয়াগুলিকে *প্রবৃত্তি মার্গ*, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ সকাম কার্যকলাপের পন্থা বলা হয়ে থাকে। মানুষ যখন তার আপন সত্তা এইভাবে পরিশুদ্ধ করে তোলে, তখন সকাম কার্যকলাপের এই জীবন পর্যায় পরিত্যাগ করে, কারণ তা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তখন পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের আরাধনা করতে পারা যায়। যে মানুষ যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের অভ্যাস অর্জন করতে পেরেছে, তার পক্ষে আর কোনও প্রকার শাস্ত্রসম্মত পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞের রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয় না। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *তস্য কার্যং ন বিদ্যতে*।

শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত অনুসারে, এই শ্লোকটিকে অন্যভাবেও উপলব্ধি করা যায়। *জীব* শব্দটির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে, কারণ বৃন্দাবনবাসীদের তিনিই জীবনদান করেছিলেন এবং *বিবর-প্রসৃতি* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও বদ্ধজীবগণের দৃষ্টির অন্তরালে, চিদ্‌জগতে তাঁর লীলাবিলাস নিত্যকাল পরিবেশন করে থাকেন, তা হলেও তিনি একই লীলা পরিবেশনের উদ্দেশ্যে জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও প্রবেশ করে থাকেন। আবার *গুহাং প্রবিষ্টঃ* শব্দগুলি বোঝায় যে, ঐ সকল লীলাবিলাস বিস্তারের পরে, ভগবান সেগুলি প্রত্যাহার করে নেন এবং সেইগুলি তখন তাঁর অপ্রকাশিত লীলাবিলাসে, অর্থাৎ যে সকল লীলা বদ্ধ জীবগণের কাছে প্রতিভাত হয় না, সেই পর্যায়ে বিরাজ করে থাকে। এই প্রসঙ্গে, *মাত্রা* শব্দটি ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়াদি বোঝায়, *স্বর* শব্দটি বোঝায় ভগবানের দিব্য ধ্বনি তরঙ্গ এবং সঙ্গীতাদি, এবং *বর্ণ* শব্দটি বোঝায় ভগবানের দিব্য রূপ। *স্থবিষ্ঠ*, অর্থাৎ "স্থূল প্রকাশ" বলতে বোঝায় যে, জড় জগতে যে সকল ভক্তের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদন সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি, এবং যাদের ভাবধারা এখনও পরিশুদ্ধ হয়নি, জড় জগতের সেই সকল ভক্তদের কাছেও তিনি অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন। *মনো-ময়* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবধারা যে কোনও ভাবেই হোক, মনের মধ্যে সমুজ্জ্বল রাখতেই হবে; এবং অভক্তদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *সূক্ষ্ম*, অর্থাৎ বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়বহির্ভূত সত্তা রূপে অনুভূত

হয়ে থাকেন, কারণ তাঁকে জানা বা বোঝা সম্ভব হয় না। তাই বিভিন্ন আচার্যবর্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে এই শ্লোকটির অন্তর্গত দিব্যধ্বনি তরঙ্গের মাধ্যমে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ১৮

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যধিমথ্যমানঃ ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥ ১৮ ॥

যথা—যেমন; **অনলঃ**—আগুন; **খে**—কাঠের মধ্যে শূন্যস্থানে; **অনিল**—বাতাস; **বন্ধুঃ**—যার সাহায্যে; **উষ্মা**—তাপ; **বলেন**—প্রবলভাবে; **দারুণি**—কাঠের মধ্যে; **অধিমথ্যমানঃ**—ঘর্ষণের ফলে প্রজ্বলিত; **অণুঃ**—অতি ক্ষুদ্র; **প্রজাতঃ**—জন্ম নেয়; **হবিষা**—ঘৃতের দ্বারা; **সমেধতে**—বৃদ্ধি পায়; **তথা**—সেইভাবে; **এব**—অবশ্য; **মে**—আমার; **ব্যক্তিঃ**—অভিব্যক্তি; **ইয়ম্**—এই; **হি**—অবশ্যই; **বাণী**—বৈদিক শব্দতরঙ্গ।

অনুবাদ

যখন জ্বালানী কাঠের খণ্ডগুলি প্রবলভাবে ঘর্ষণ করা হয়, তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে তাপ সৃষ্টি হয়, এবং একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। একবার অগ্নি প্রজ্বলিত হলেই, তাতে ঘি দিতে হয় এবং তখন আগুন জ্বলে ওঠে। ঠিক সেইভাবেই, বৈদিক শাস্ত্রাদির শব্দতরঙ্গের মাঝে আমি অভিব্যক্ত হয়ে থাকি।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বৈদিক জ্ঞানের অতি নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রাদি প্রথমে সাধারণ জাগতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে এবং সকল কর্মফল আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞের মাধ্যমে সমর্পণের বিধিব্যবস্থা সম্পন্ন করে, যার ফলে যজ্ঞকর্তার ভবিষ্যত কর্মফল মঙ্গলজনকভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য অবশ্য জড়জাগতিক কর্মীকে তার কর্মফল পরম বৈদিক অধিকর্তার উদ্দেশ্যে সমর্পণের জন্য উৎসাহ প্রদান করা। সুদক্ষ সকাম কর্মী ক্রমশই জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগের সম্ভাবনাগুলি নিঃশেষ করে ফেলে এবং স্বভাবতই তার জীবনধারার মর্যাদা নিয়ে দার্শনিক কল্পনার উৎকর্ষতার পর্যায়ে মগ্ন হতে থাকে। জ্ঞানসম্পদ বৃদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তখন ক্রমশই পরমেশ্বরের অনন্ত মহিমা সম্পর্কে অবহিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে অপ্রাকৃত পরম তত্ত্বের উদ্দেশ্যে

প্রেমভক্তি অনুশীলনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক জ্ঞানের লক্ষ্য, সেকথা ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। কাষ্ঠ খণ্ড ঘর্ষণের ফলে যেভাবে ক্রমশ অগ্নির প্রকাশ ঘটে, ঠিক সেইভাবেই বৈদিক যাগযজ্ঞাদির প্রগতির ফলে ভগবান ক্রমশ অভিব্যক্ত হন। *হবিষা সমেধতে* (ঘৃত সংযোগে অগ্নির বৃদ্ধি হয়) শব্দগুলির দ্বারা বোঝায় যে, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির ক্রমশ প্রগতির মাধ্যমে দিব্য পারমার্থিক জ্ঞানের অগ্নি ক্রমশ প্রজ্বলিত হয়, সর্ব বিষয় আলোকোজ্জ্বল করে তোলে, এবং সকাম কর্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেছিলেন যে, উদ্ধব যথার্থই পারমার্থিক দিব্যজ্ঞান এই ভাবে বিস্তারিত পদ্ধতিতে শ্রবণের সর্বাপেক্ষা যোগ্য পুরুষ; তাই ভগবান কৃপাপূর্বক উদ্ধবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তিনি বদরিকাশ্রমে ঋষিবর্গকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, এবং তার ফলে ঋষিবর্গের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

শ্লোক ১৯

এবং গদিঃ কর্ম গতির্বিসর্গো
ঘ্রাণো রসো দৃক্ স্পর্শঃ শ্রুতিশ্চ ।
সংকল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ
সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **গদিঃ**—বাক্; **কর্ম**—হাতের ক্রিয়াকলাপ; **গতিঃ**—পায়ের ক্রিয়াকলাপ; **বিসর্গঃ**—উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াকলাপ; **ঘ্রাণঃ**—অঘ্রাণ; **রসঃ**—আস্বাদন; **দৃক্**—দৃষ্টি; **স্পর্শঃ**—স্পর্শ; **শ্রুতিঃ**—শ্রবণ; **চ**—ও; **সংকল্প**—মনের ক্রিয়াকলাপ; **বিজ্ঞানম্**—বুদ্ধি এবং চেতনার ক্রিয়াকলাপ; **অথ**—এছাড়াও; **অভিমানঃ**—অহমিকার ক্রিয়াকলাপ; **সূত্রম্**—প্রধান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম কারণাদি; **রজঃ**—রজোগুণ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **তমঃ**—এবং তমোগুণের; **বিকারঃ**—ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

কর্মেন্দ্রিয়গুলি—বাক্-ইন্দ্রিয়, হাত, পা, উপস্থ ও পায়ুর ক্রিয়াকলাপ—এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়াকলাপ—তার সাথে মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার স্বরূপ মনের সূক্ষ্ম চেতনার ক্রিয়াকলাপ, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রধান অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ ও ত্রৈগুণ্যের প্রভাব—এই সবকিছুই আমার জড়জাগতিক অভিব্যক্ত রূপ বলে জানতে হবে।

থাকে। সেইভাবেই, পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, যিনি সকলকে জীবন প্রদান করেন এবং যিনি নিত্য বিরাজমান, মূলত তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশের আয়ত্তের বাইরে অবস্থান করে থাকেন। কালের প্রভাবে, অবশ্য ভগবান জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের আধার এবং মহাবিশ্বরূপ পদ্মফুলের উৎস, যার মাঝে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিপ্রকাশ হয়েছে তিনি তাঁর জড়জাগতিক শক্তিকে বিভাজিত করেন, এবং তিনি একই সত্তার অধিকারী হলেও অগণিত রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বীররাঘবাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশ যার মধ্যে দেবতাগণ, জনমানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, গ্রহনক্ষত্র, মহাশূন্য, ইত্যাদি বিরাজমান, তা সবই মূলত কার অধিকারভুক্ত, সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতেই পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রকাশ সম্পর্কে সব রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন করছেন। *ত্রি-বৃৎ* শব্দটি বোঝায় যে, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দোষ স্বতঃ ক্রিয় নয়, বরং তা কোনও এক পরম শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। *বৃৎ* উপসর্গটির অর্থ *বর্তনম্*, অর্থাৎ "বর্তমানে বিরাজিত", পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের প্রভাব। *অজ-যোনি* শব্দটির বিশ্লেষণে দেখা যায়—*অপ্* বলতে বোঝায় "জল", এবং *জ* বোঝায় "জন্ম"। এইভাবে *অজ* মানে জটিল গূঢ় বাস্তব জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যা গর্ভোদক সমুদ্রে শায়িত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীর থেকে অঙ্কুরিত হচ্ছে। *যোনি* অর্থাৎ "উৎস", বলতে বোঝায় পরমেশ্বর ভগবান এবং তাই *অজযোনি* মানে ভগবান মহাবিশ্বের সকল অভিব্যক্তির মূল সূত্র; অবশ্য সকল সৃষ্টিই ভগবানেরই মধ্যে ঘটেছে। যেহেতু জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য দোষও ভগবানের পরম নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, তাই জড়জাগতিক বিষয়বস্তুগুলি সবই অসহায়ভাবে ভগবানের ইচ্ছাধীনে মহাবিশ্বের আবরণের মধ্যে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মাধ্যমে আসা-যাওয়া করছে। *অব্যক্ত* শব্দটি বোঝায় যে, ভগবানের সূক্ষ্ম চিন্ময় রূপ বৈশিষ্ট্য জড়জাগতিক সৃষ্টির পূর্বেই এককভাবে বিরাজিত থাকে। 'যেহেতু ভগবানের আদি রূপটি চিন্ময়, তাই তাঁর জন্ম হয় না, পরিবর্তন বা বিনাশও হয় না। সেই রূপ নিত্য স্থিত। কালের প্রভাবে, ভগবানের জড়া শক্তি বিভাজিত হয়ে যায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দেহজাত বৈশিষ্ট্য, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, দৈহিক বিকাশ, অহমিকা এবং মিথ্যা প্রভুত্ব বোধ রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। এইভাবেই ভগবান তাঁর চেতন শক্তিকে *জীবশক্তি* রূপে বিস্তারিত করেন, যা অগণিত জড়জাগতিক রূপ পরিগ্রহ করে মানুষ, দেবতা, পশু-পাখি ইত্যাদি আকারে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপনের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একটি মাত্র সূত্র

থেকে অগণিত রূপের অভিব্যক্তি ঘটতেই পারে। তেমনই, যদিও ভগবান একাকী, তবু তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির বিকাশের মাধ্যমে অগণিত রূপে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন।

শ্লোক ২১

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং
পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ ।
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে ॥ ২১ ॥

যস্মিন্—যাঁর মধ্যে; **ইদম্**—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; **প্রোতম্**—পোড়েন বুনন; **অশেষম্**—সমগ্র; **ওতম্**—এবং টানা বুনন; **পটঃ**—বস্ত্রখণ্ড; **যথা**—ঠিক যেমন; **তন্তু**—সুতোর; **বিতান**—বিস্তারে; **সংস্থঃ**—অবস্থিত; **যঃ**—যা; **এষঃ**—এই; **সংসার**—জড়জাগতিক অস্তিত্ব; **তরুঃ**—গাছ; **পুরাণঃ**—স্মরণাতীত কাল থেকে অবস্থিত; **কর্ম**—সকাম কর্মের প্রতি; **আত্মকঃ**—স্বাভাবিক প্রবণতায়; **পুষ্প**—প্রথম লাভ, ফুল ফোটা; **ফলে**—এবং ফল; **প্রসূতে**—সৃষ্টি হয়।

অনুবাদ

যেভাবে পট্টবস্ত্রখণ্ড দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে টানা-পোড়েন বুননের সাহায্যে তৈরি হয়ে থাকে, তেমনই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থব্যাপী সুপ্রসারিত শক্তির উপরে বিস্তারিত হয়ে রয়েছে এবং তা সবই তাঁরই মধ্যে বিরাজ করছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই বদ্ধ জীব জড়জাগতিক শরীরাদি ধারণ করে চলছে, এবং এই শরীরগুলি ঠিক যেন বিশাল বৃক্ষাদির মতোই জড়জাগতিক অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে। ঠিক যেভাবে কোনও বৃক্ষ প্রথমে পুষ্পশোভিত হয় এবং পরে ফল সৃষ্টি করে, তেমনই জড়জাগতিক অস্তিত্বের বৃক্ষস্বরূপ প্রত্যেক জীবের জড়জাগতিক শরীরটিও জড়জাগতিক অস্তিত্বের বিবিধ ফল সৃষ্টি করে থাকে।

তাৎপর্য

ফল সৃষ্টির আগে বৃক্ষে ফুল ফোটে। তেমনই, *পুষ্প-ফলে* শব্দটি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জড়জাগতিক জীবনধারার সুখ-দুঃখের কথাই বোঝায়। জড়জাগতিক জীবনধারা বেশ পুষ্পশোভিত প্রস্ফুটিত আনন্দময় মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর মতো অন্যান্য দুর্বিপাক তিক্ত ফলের মতো উদ্ভূত হবে। জড়জাগতিক দেহটির মধ্যে সকল সময়ে ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রবণতা থাকে বলে সেটাই সমস্ত জড়জাগতিক অস্তিত্বের

দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হয়ে ওঠে এবং তাই এটিকে *সংসার-তরু* বলা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি আত্মসাৎ করে উপভোগের প্রবণতা স্মরণাতীত কাল থেকেই বিদ্যমান, সেই বিষয়েই *পুরাণঃ কর্মাত্মকঃ* শব্দগুলির মাধ্যমে অভিপ্রকাশ হয়েছে। জড়জাগতিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর ভগবানেরই মায়াশক্তির বিস্তার মাত্র এবং তা সদাসর্বদাই তাঁর উপরে নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে এবং তা সর্বাঙ্গীনভাবেই তাঁর দিব্য সত্তা থেকে অভিন্ন। এই সামান্য উপলব্ধিটুকু হলেই বদ্ধ জীবাত্মগণ মায়ার দুঃখময় রাজ্যে অনন্তকাল ভ্রমাত্মক বিচরণের দুঃখকষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে।

পুষ্প-ফলে শব্দটির মাধ্যমেও ইন্দ্রিয় উপভোগ এবং মুক্তিলাভের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে, তা বুঝতে হবে। জড়জাগতিক জীবনের অস্তিত্বস্বরূপ বৃক্ষটির বিষয়ে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে।

শ্লোক ২২-২৩

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ ২২ ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈঃ
মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥ ২৩ ॥

দ্বে—দুই; **অস্য**—এই বৃক্ষটির; **বীজে**—বীজগুলি; **শত**—শত শত; **মূলঃ**—শিকড়ের; **ত্রি**—তিন; **নালঃ**—গাছের কাণ্ড বা গুঁড়ি; **পঞ্চ**—পাঁচ; **স্কন্ধঃ**—শাখা; **পঞ্চ**—পাঁচ; **রস**—রস; **প্রসূতিঃ**—প্রস্তুত করে; **দশ**—দশ; **এক**—এবং এক; **শাখঃ**—শাখাগুলি; **দ্বি**—দুটি; **সুপর্ণ**—পাখিদের; **নীড়ঃ**—বাসা; **ত্রি**—তিন; **বল্কলঃ**—বৃক্ষের ছাল; **দ্বি**—দুটি; **ফলঃ**—ফলগুলি; **অর্কম্**—সূর্য; **প্রবিষ্টঃ**—ভিতরে প্রবেশ করে; **অদন্তি**—তারা ভক্ষণ করে বা ভোগ করে; **চ**—ও; **একম্**—এক; **ফলম্**—ফল; **অস্য**—এই বৃক্ষটির; **গৃধ্রাঃ**—জড়জাগতিক উপভোগে যারা বাসনাজর্জরিত; **গ্রামে**—গার্হস্থ্য জীবনে; **চরাঃ**—বাস করে; **একম্**—অন্য এক; **অরণ্য**—বনের মধ্যে; **বাসাঃ**—যারা বাস করে; **হংসাঃ**—হাঁসের মতো, পরম হংস সাধুজনেরা; **যঃ**—যিনি; **একম্**—

একমাত্র পরমাত্মা; বহুরূপম্—বহু রূপে অভিপ্রকাশিত; ইজ্যৈঃ—পূজনীয় গুরুদেবের সহযোগিতায়; মায়াময়ম্—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন; বেদ—জানে; সঃ—যে জন; বেদ—জানেন; বেদম্—বৈদিক শাস্ত্রাদির যথার্থ ভাবসম্পদ।

অনুবাদ

জড়জাগতিক জীবনধারার এই বৃক্ষটির দুটি বীজ, শত শত শিকড়, তিনটি গুঁড়ি বা কাণ্ড এবং পাঁচটি শাখা আছে। এই বৃক্ষে পাঁচটি সুগন্ধ সৃষ্টি হয় এবং তার এগারটি প্রশাখা আছে এবং দুটি পাখির তৈরি একটি বাসা আছে। বৃক্ষটি তিন ধরনের বল্কলে আবৃত আছে, দুটি ফল প্রদান করে এবং সূর্যালোকের অভিমুখে প্রসারিত হয়ে থাকে। যারা জড়জাগতিক ভোগ-উপভোগে লোভী এবং গার্হস্থ্য জীবন উপভোগে বৃক্ষটির ফলগুলির একটি ফল আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়, এবং সন্ন্যাস জীবনে অভ্যস্ত পরমহংসতুল্য মানুষেরা অন্য ফলটির আস্বাদন করে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুবর্গের সহায়তা নিয়ে যেব্যক্তি এই বৃক্ষটিকে বিভিন্ন রূপ নিয়ে অভিব্যক্ত একমাত্র পরমতত্ত্বেরই শক্তির অভিপ্রকাশ বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনিই যথার্থভাবে বৈদিক শাস্ত্রাদির অর্থ বুঝেছেন।

তাৎপর্য

এই বৃক্ষটির বীজ দুটি পাপকর্ম ও পুণ্যকর্ম, এবং শত শত শিকড়গুলি জীবগণের অগণিত জড়জাগতিক বাসনা যেগুলি তাদের জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তিনটি শাখা জড়াপ্রকৃতির ত্রৈগুণ্য স্বরূপ, এবং উপরের পাঁচটি প্রশাখা পাঁচটি জড়জাগতিক উপাদানের প্রতীক। বৃক্ষটি থেকে পাঁচ প্রকার রস সুগন্ধের সৃষ্টি হয়ে থাকে—যথা, শব্দ, রূপ, স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধ—এবং এগারটি প্রশাখা আছে,—যথা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন। দুটি পাখি, যথা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই বৃক্ষটিতে বাসা বেঁধেছে, এবং তিন ধরনের বল্কল হল বায়ু, পিত্ত এবং কফ, যেগুলি দেহের মূল উপাদান। এই বৃক্ষটির দুটি ফলের নাম সুখ এবং দুঃখ।

সুন্দরী নারী, অর্থ এবং অন্যান্য বিলাসিতাপূর্ণ বিষয়াদির মাধ্যমে যারা মায়ার সুখ উপভোগ করতে চায়, তারা দুঃখেরই ফল ভোগ করে থাকে। মনে রাখা উচিত যে, স্বর্গেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যু আছে। যারা জড়জাগতিক লক্ষ্য বর্জন করেছে এবং পারমার্থিক জ্ঞান অর্জনের পথ অনুসরণ করছে, তারাই সুখের ফল আস্বাদন করে। পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এই বিস্তারিত বৃক্ষটি নিতান্তই *একমেবাদ্বিতীয়ম্* পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তির অভিপ্রকাশ। যদি পরমেশ্বর ভগবানকে সব কিছুর পরম কারণ

রূপে উপলব্ধি করা যায়, তা হলে মানুষের জ্ঞান সার্থকতা অর্জন করে। নতুবা, পরমেশ্বর ভগবানের বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি এবং বৈদিক ভাব বিলাসের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়লে, জীবনে যথার্থ সার্থকতা অর্জন করা যায় না।

শ্লোক ২৪

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥ ২৪ ॥

এবম্—এইভাবে (আমি যেভাবে তোমাকে জ্ঞান প্রদান করেছি); **গুরু**—পারমার্থিক গুরু; **উপাসনয়া**—উপাসনার মাধ্যমে লব্ধ; **এক**—অনন্য; **ভক্ত্যা**—প্রেমভক্তি সহকারে; **বিদ্যা**—জ্ঞানের; **কুঠারেণ**—কুঠার দ্বারা; **শিতেন**—তীক্ষ্ণ; **ধীরঃ**—জ্ঞানের মাধ্যমে সুস্থির; **বিবৃশ্চ্য**—কেটে দিয়ে; **জীব**—জীব; **আশয়ম্**—সূক্ষ্ম শরীর (জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দ্বারা উদ্ভূত দেহাত্মবুদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট পরিচয়াদি); **অপ্রমত্তঃ**—পারমার্থিক জীবনে বিশেষ মনোযোগী; **সম্পদ্য**—সম্পাদন করার পরে; **চ**—এবং; **আত্মনম্**—পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবান; **অথ**—তখন; **ত্যজা**—আপনার বর্জন করা উচিত; **অস্ত্রম্**—যে সকল উপায় অবলম্বনে সার্থকতা অর্জন করা গেছে।

অনুবাদ

পারমার্থিক সদ্‌গুরুর একনিষ্ঠ উপাসনার মাধ্যমে এবং ধীরস্থির বুদ্ধির প্রয়োগে, দিব্য জ্ঞানের কুঠার দিয়ে আত্মার সূক্ষ্ম জড় বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উপলব্ধির মাধ্যমে, তখন সেই সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত।

তাৎপর্য

যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একান্তভাবে সঙ্গলাভের সৌভাগ্য উদ্ধব অর্জন করেছিলেন, তাই বদ্ধ জীবের মতো মানসিকতা নিয়ে চলবার কোনই প্রয়োজন তাঁর পক্ষে হয়নি, এবং তাই, এখানে *সম্পদ্য চাত্মানম্* শব্দগুলির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, উদ্ধব স্বয়ং চিদ্‌জগতে ভগবানের চরণকমলের সেবা করতে পারতেন। অবশ্য, এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রারম্ভেই উদ্ধব এই সুযোগ লাভ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এখানে তাই বলা হয়েছে, *গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যাঃ* পারমার্থিক সদ্‌গুরুকে উপাসনার মাধ্যমে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সেবা অনুশীলন করতে পারা যায়। এখানে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি কিংবা পারমার্থিক সদ্‌গুরু বর্জনের কথা বলা হয়নি।

বরং, এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *বিদ্যাকুঠারেণ* শব্দটির মাধ্যমে এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত উপায়ে জড়জাগতিক পৃথিবীর জ্ঞানচর্চা করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে জড়জাগতিক সৃষ্টির প্রত্যেকটি বিষয়ই ভগবানের মায়াবলের বিস্তার মাত্র। সুতীক্ষ্ণ কুঠারের মতোই সেই জ্ঞান জড়জাগতিক জীবনধারার মূল উচ্ছেদ করে। এইভাবেই, জড়া প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যের দ্বারা সৃষ্ট অবাধ্য সূক্ষ্ম শরীরটিকে ছিন্নভিন্ন করা হয়, এবং মানুষ তখন অপ্রমত্ত, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনে সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সতর্ক হয়ে ওঠে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবেই এই অধ্যায়টিতে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৃন্দাবনের গোপিকারা জ্ঞান বিশ্লেষণের জীবনধারায় আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে ছিলেন এবং অন্য কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেও পারতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, আত্মস্বার্থ বর্জিত ভগবৎপ্রেমের পরম তীব্রতা বিকাশের উদ্দেশ্যে ব্রজধামের গোপিকাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই তাঁর সকল ভক্তবৃন্দের উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জড় জগতের প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যাতে যে সব বদ্ধ জীবগণ এই জগতে ভোগ উপভোগ করতে অভিলাষী হচ্ছে, তারা এই জ্ঞানের সাহায্যে জড়জাগতিক জীবনধারার মূল উচ্ছেদ করতে পারে। *সম্পদ্য চাত্মানম্* শব্দগুলি বোঝায় যে, এই ধরনের জ্ঞান অর্জনের ফলে মানুষের আর কোনও জড়জাগতিক অস্তিত্ব থাকে না, কারণ সে ইতিমধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করেছে। মায়াময় সৃষ্টির মাঝে তার জ্ঞান-উপলব্ধি চিরকাল যাবৎ পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য সেই ধরনের মানুষকে আর ইতস্তত ভ্রমণ করতে হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জীবনের সব কিছু মনে করার মাধ্যমে যে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জন করেছে, সে ভগবানের সেবা অনুষ্ঠানে নিত্য সুখ উপভোগ করতে পারে। তা সত্ত্বেও তখন সে এই জগতে অবস্থান করলেও, এই জগতের সঙ্গে তার অন্য কিছুই করণীয় থাকে না এবং সে তখন বিতর্কমূলক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে আর এই জাগতিক জীবনধারাকে বাতিল করার কোনই প্রয়াস করে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে উদ্ধবকে বলেছেন—*ত্যজাস্ত্রম্*, "বিতর্কমূলক জ্ঞানের যে অস্ত্রটি দিয়ে তুমি তোমার অধিকার প্রতিপত্তির ধারণা এবং জড় জগতের অধিষ্ঠান ছিন্ন করতে পেরেছ, সেটি এখন তুমি পরিত্যাগ কর।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানের ঊর্ধ্বে' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।